গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ শরীয়তপুর

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
শরীয়তপুর

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েবসাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস

জেলা তথ্য : শরীয়তপুর

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ, ড. মোঃ লিয়াকত আলী ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া ।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় রয়েছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে শরীয়তপুর জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি সম্পদ, বনজ ও ফলজ সম্পদ এবং মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর ও বাংলাপিডিয়া থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে শরীয়তপুরের উপর লিখিত অন্যান্য বই থেকে -

১। বি.বি.এস., ২০০১, কৃষি শুমারী ১৯৯৬, জেলা সিরিজ শরীয়তপুর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জুলাই ২০০১

২। ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২, বাংলাদেশের নদীমালা। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২

৩। সিকদার, রব, আব্দুর, ১৯৯৬. শরীয়তপুরের অতীত ও বর্তমান, ১৯৯৬.

৪। PDO-ICZMP, 2001.Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh, Dhaka, August 2001

৫। CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services, Dhaka, May 2004.

৬। Khan, I., Nurul, 1977. Bangladesh District Gajetteers Faridpur, Establishment, Division, Government of the People’s Republic of Bangladesh. Dhaka, December 1982

এ ছাড়াও বইটির পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা	**১-৫**
এক নজরে শরীয়তপুর	২
জেলার অবস্থান	৩
উপজেলা তথ্য সারণী	৪-৫
প্রকৃতি ও পরিবেশ	**৭-১১**
প্রাকৃতিক পরিবেশ	৭
কৃষি সম্পদ	৯
দুর্যোগ	১০
বিপদাপন্নতা	১১
জীবন ও জীবিকা	**১৩-১৬**
জনসংখ্যা	১৩
জনস্বাস্থ্য	১৩
শিক্ষা	১৪
সামাজিক উন্নয়ন	১৪
প্রধান জীবিকা দল	১৪
অর্থনৈতিক অবস্থা	১৫
দারিদ্র্য	১৫
নারীদের অবস্থান	**১৭-১৮**
অবকাঠামো	**১৯-২১**
রাস্তা-ঘাট	১৯
নৌ-পথ	১৯
হাট-বাজার ও বন্দর	১৯
বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ	১৯
শিল্পাঞ্চল	২০
সেচ ও গুদাম	২০
উন্নয়ন প্রকল্প	২০
হোটেল অবকাশ কেন্দ্র	২১
সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা	**২৩-২৫**
পরিবেশগত সমস্যা	২৩
কৃষি বিষয়ক সমস্যা	২৪
আর্থ-সামাজিক সমস্যা	২৩
সম্ভাবনা ও সুযোগ	**২৭-২৮**
কৃষি ও অর্থনীতি	২৭
প্রাকৃতিক সম্পদ	২৭
শিল্প উন্নয়ন	২৮
ভবিষ্যতের রূপরেখা	**২৯**
দর্শনীয় স্থান	**৩১-৩২**

জেলা মানচিত্র

SHARIATPUR DISTRICT
BANGLADESH
Bay of Bengal
MUNSHIGANJ
MADARIPUR
CHANDPUR
BARISAL
SHARIATPUR
Zanjira
Naria
Bhedarganj
Damudya
Gosairhat
Padma R
Meghna R
Palong R
Naria Khal
Arial Khan R
90°15'
90°20'
90°25'
90°30' E
90°40'
23° 35'
23° 25'
23° 15'
23° 05'
5 0 5 10 km
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/Thana/Head Quarter
Regional Highway
Feeder Road
Embankment
Waterbody
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

শরীয়তপুর জেলার সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নদীকে ঘিরে। নদ-নদী, বিল-বাওড়, পুকুর ও বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ জেলার প্রাকৃতিক রূপকে করেছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শরীয়তপুর জেলার উত্তরে মুন্সিগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে বরিশাল, পূর্বে চাঁদপুর এবং পশ্চিমে মাদারীপুর জেলা।

শরীয়তপুর জেলা ইতিহাসখ্যাত বিক্রমপুরের দক্ষিণাঞ্চল আর প্রাচীন বরিশালের ইদিলপুর পরগণার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। ১৮৬৯ সালের আগ পর্যন্ত এ অঞ্চল বিক্রমপুরের অংশ ছিল। পদ্মার গতি পরিবর্তনের ফলে বৃটিশ সরকার পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলকে বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত করেন। এই অঞ্চলের লোকের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মাদারীপুর মহকুমা ১৮৭৩ সালে ফরিদপুরের সাথে সংযুক্ত করে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৯১২ সালে মাদারীপুরের পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক মহকুমা গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এরপর ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় একটি প্রশাসনিক মহকুমা তৈরির। ১৯৭৭ সালের ১০ই আগস্ট মহকুমা ঘোষিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের ৭ই মার্চ জেলা ঘোষণা হয়। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের তথা ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা বিশিষ্ট সমাজসেবী হাজী মোঃ শরীয়ত উল্লাহর নামানুসারে জেলার নাম হয় শরীয়তপুর।

শরীয়তপুর জেলার মোট আয়তন ১,১৮১ বর্গ কি.মি.। আয়তনে এই জেলা দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২ তম, ঢাকা বিভাগের ১৭টি জেলার মধ্যে ১২ তম স্থানে এবং উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ১৬ তম।

৬টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভা, ৬৪টি ইউনিয়ন, ৪৫টি ওয়ার্ড, ১,২৪৩টি গ্রাম এবং ৬১৬টি মৌজা নিয়ে শরীয়তপুর জেলা। শরীয়তপুর সদর (আগে পালং নামে পরিচিত ছিল), ভেদরগঞ্জ, ডামুড্ডা, গোসাইরহাট, নড়িয়া আর জাজিরা জেলার ৬টি উপজেলা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে শরীয়তপুর জেলা ৬টি উপজেলাকেই অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপজেলা	**৬**
পৌরসভা	**৫**
ইউনিয়ন	**৬৪**
ওয়ার্ড	**৪৫**
মৌজা	**৬১৬**
গ্রাম	**১,২৪৩**

এক নজরে শরীয়তপুর

	বিষয়	একক	শরীয়তপুর	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১,১৮১	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৬	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৬৬	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৫	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৪৫	৭৪৩	২৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৬১৬	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	১,২৪৩	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১০.৮০	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৫.৪৩	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৫.৩৭	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৯১৪	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ ও নারীর অনুপাত	অনুপাত	১০১.১	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫.১	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.১৩	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৫.৫৭	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৫	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১০	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৭	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৯৩	০.৭১	০.৬৯	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৪৯	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	১,৪৬২	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১২,৯৩৬	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	১৪,৬১০	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৫	২৬	২৮	২০০১ (নির্পোর্ট, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩১	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	০.০৭	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৭	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৪৩.৬	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	২১.৪	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৮৩	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর$^{+}$	মোট জনসংখ্যা (%)	৩৮	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৪১	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৩৫	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর$^{+}$	মোট জনসংখ্যা (%)	৪১	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৪৭	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৩৬	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৮৪	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯২	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৬	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/ শয্যা	৪,৮৭৫	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫৮	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯৬	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৮	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৪	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	১৩	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৪	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩৮	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পোর্ট, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার চেয়ে ভাল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪%, যা জাতীয় হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় (৫.৪%) অঞ্চলের হারের সমান।
- জেলার মোট জনসংখ্যার (৯২%) কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯০.৬) হারের ও উপকূলীয় (৮৮%) হারের বেশি।
- জেলার গড়ে প্রতি ৪৯ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় সুবিধাজনক।
- রাস্তার ঘনত্ব ০.৯৩ কি.মি./বর্গ কি.মি., যা জাতীয় (০.৭২ কি. মি./বর্গ কি.মি.) তুলনায় বেশি ও উপকূলীয় (০.৭৬ কি. মি./বর্গ কি.মি.) তুলনায় বেশি।
- জেলায় দারিদ্র্যপীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৪৪%, ২১%), যা উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%, ২৪%) চেয়ে কম।
- জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা ৪৭.৩%, যা জাতীয় (৫২.৬%) তুলনায় এবং উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৫৩.৫%) নেতিবাচক।
- জেলার মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮জন, যা জাতীয় (৫ জন) হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় প্রায় সমান (৫জন)।
- লিঙ্গীয় অসমতা কম।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- শরীয়তপুর জেলায় মাথাপিছু আয় ১২,৯৩৬ টাকা, যা জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- সার্বিক সাক্ষরতার হার ৩৮%, যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) হারের তুলনায় কম।
- দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টিমানের ভিত্তিতে জেলায় দারিদ্র্যপীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৪৪%, ২১%), যা জাতীয় (৪৯%, ২১.৪%) সংখ্যার তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১৭%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ ১০%, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় অনেক কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা ৬৬%, যা জাতীয় অঞ্চলের (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৮ জন, যা জাতীয় (৪৩ জন) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৪,৮৭৫ জন, যা জাতীয় (৪২৭৬ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪৬৩৭ জন) তুলনায় নেতিবাচক।
- জেলা শহুরে জনসংখ্যা ৯.২৮%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলায় ১৫-৪৯ বয়সদলের ২৫% নারী খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) তুলনায় কম।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৮%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় ৩৬% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় অঞ্চলের তুলনায় (৩৭%) প্রায় সমান এবং উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৪৮%) কম।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	শরীয়তপুর	উপজেলা		
				সদর	ভেদরগঞ্জ	ডামুড্ডা
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১,১৮২	১৭৫	২৬৭	৯২
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১১১	২০	২২	১৬
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৭১৬	১১২	১০৬	৭৪
	গ্রাম	সংখ্যা	১,২৪৩	১৫১	৩৬৮	১১৩
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১০.৮০	২.০০	২.৩৭	১.০৭
	পুরুষ	লাখ	৫.৪৩	১.০১	১.২০	০.৫৩
	নারী	লাখ	৪.৩৭	০.৯৮	১.১৬	০.৫৪
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৯১৪	১,১৪৩	৮৯০	১,১৭২
	নারী পুরুষের অনুপাত	অনুপাত	১০০:১০১.১	১০০:১০৩	১০০:১০৪	১০০:৯৮
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.১৩	০.৩৭	০.৪৬	০.২০
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৫.১	৫.৩৫	৫.০৮	৫.২০
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	৫.৫	১.৮	২.০	২.৭
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৫	৩৩	২৯	৩৩
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২	৬২	৫৯	৬৯
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩	৬.৫০	১.৪১	৬.৭৭
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৭৭২	১৫৫	১৪৩	৮৬
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১০২	২২	২৩	১০
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৬	২	৪	১
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থের (%)	৩১	২৭	২১	২৩
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৭৭	৮৪	৮০	৭৮
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	২৩	১৬	২০	২২
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	৭৩,৫২০	১০,৮৮০	১৮,৮৯৫	৬৩৭৫
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	২২	১৮	-	৩
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৫০	৭২	-	৪৮
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	২৮	১০	-	৪৯
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৭,০০০	৪,০০০	৭,০০০	৭,০০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৩৮	৪৪	৪০	৩৬
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৮৩	৯০	৭৯	৮২
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৮৬	৯২	৮৪	৮৬
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১২,৬২৯	২,১২০	২,৫২৩	১,৪২৮
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৮৬	৮৯	৮৮	৮৬
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৮৭	৭	৩	৮

উপজেলা			তথ্য সূত্র ও বছর
গোসাইরহাট	নড়িয়া	জাজিরা	
১৬৮	২৪০	২৪০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৭	২৪	২২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৮৪	১৮১	১৫৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২১০	১৯০	২১১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.২২	২.২৫	১.৮৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৬০	১.১১	০.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৬১	১.১৪	০.৯১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৭৩২	৯৪০	৭৮০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০০:৯৮	১০০:৯৭	১০০:১০৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.২৫	০.৪৪	০.৩৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪.৮৩	৫.০৮	৪.৮৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.৪	২.০	১.৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২২	৪৬	৩১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৫০	৭৩	৩৬	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১.৯১	৩.৪৭	১.৪৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১০৯	১৫২	১২৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
৯	২৩	১৫	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
১	৪	৪	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
২৯	২৪	৩৪	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭৪	৭৫	৭৯	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২৬	২৫	২১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৮,৯৮৮	১৪,৭৩৬	১৩,৬৪৩	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২৯	৪৭	-	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৫১	৩৮	-	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
২০	১৬	-	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৪,০০০	৫,০০০	৭,০০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৩০	৪২	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৮৭	৯২	৬৯	২০০১(প্রা.শি.অ)
৮৯	৯৬	৭১	২০০১(প্রা.শি.অ)
১,৬০৭	৩,২৪৭	১,৭০৪	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
৮৪	৭৭	৯৭	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৪	৬	৩	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে ঘেরা এই জেলা। জেলায় নদী-খাল, বিল, বাওড়, চর ও ফসলের ভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছে জেলার প্রকৃতি। দুই নদীর মোহনা এবং ছোট দ্বীপ আকারের চর নিয়ে কৃষি নির্ভর জেলার একদিকে পদ্মা-মেঘনার ভাঙনে বাড়ি ঘর বিলীন হয়ে যায় আর অন্যদিকে নতুন চর জেগে ওঠে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

নদী : বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ এই জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। পদ্মা নদী জেলার উত্তর সীমান্ত , মেঘনা এই জেলার পূর্ব সীমান্ত এবং আড়িয়াল খাঁ পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বয়ে গেছে। এ ছাড়া জেলায় রয়েছে পালং, কীর্তিনাশা ও আঙ্গারীয়া নদী।

জেলায় প্রায় ২১২ বর্গ কি. মি. জুড়ে রয়েছে নদী। এই জেলার বুক চিরে বয়ে গেছে বেশ কয়েকটি বড় নদী। আর জালের মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বহু ছোট নদী-নালা আর খাল। এই জেলা একসময় বিক্রমপুরের অংশ ছিল, পরবর্তীতে পদ্মা নদী গর্ভে চলে যায় এবং পরে চর জেগে ওঠে।

জেলার নদীগুলোতে বিশেষ করে পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, পালং, আঙ্গারিয়াতে প্রায় সারা বছর পানি থাকে। তবে অনেক খাল ও নদী আছে যেখানে শুষ্ক মৌসুমে কোন প্রবাহ থাকে না। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে ঐ সকল নদী ও খালে পূর্ণ প্রবাহ থাকে। যেমন, কীর্তিনাসা, আঙ্গারীয়া, লাউখোলা নদী ইত্যাদি।

চরাঞ্চল : পদ্মা, মেঘনা ও আড়িয়াল খাঁ নদী বিধৌত শরীয়তপুরে ভাঙা-গড়া সব সময় চলছে। ফলে শরীয়তপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। চর এই জেলার অবিচ্ছেদ্য জনপদ। জেলার নিম্নাঞ্চল ক্রমাগত পলিতে ভরাট হয়।

পুকুর : এই জেলায় ১৮৮৭ হেক্টর পুকুর আছে। এর মধ্যে ৯০৪ হেক্টর পুকুরে মাছ চাষ হয়। চাষাবাদযোগ্য পুকুর আছে ৬২৯ হেক্টর এবং পতিত আছে ৩৫৪ হেক্টর। এর মধ্যে ৯০৪ হেক্টর পুকুর থেকে উৎপাদন হয় ২৮২৮ মে. টন মাছ। চাষাবাদযোগ্য পুকুর উৎপন্ন হয় ৬৫৯ মে. টন এবং পতিত পুকুর থেকে উৎপন্ন হয় ৩৩৯ মে. টন। মোট উৎপাদন হয় ৩৮২৬ মে. টন (মৎস্য বিভাগ ২০০৩) ।

পুকুরের মাছ উৎপাদন

	জমি হেক্টর	উৎপাদন মে.টন
চাষ করা পুকুর	৯০৪	২৮২৮
চাষযোগ্য পুকুর	৬২৯	৬৫৯
পতিত পুকুর	৩৫৪	৩৩৯

বনভূমি : শরীয়তপুর জেলায় কোন প্রাকৃতিক বনভূমি নেই। জেলার বসত ভিটায়ই শুধু গাছ-গাছালি দেখা যায়। যেমন, আম, জাম, কাঁঠাল, রেইনট্রি, কড়ই, সোনালু, জলপাই, গাব, কদম, নিম, জিকা বা কাউফলা, বাবলা, সাজনা, মেহগনি, জলপাই, জাম্বল, আমলকি, বেল, তেতুল, কামরাঙ্গা, ডুমুর, কাঠাদাম, জামরুল, বাতাবী লেবু, তাল, সুপারি ইত্যাদি। এ ছাড়াও এই জেলায় সর্বত্র খেজুর গাছ এবং বাঁশ দেখা যায়। এই জেলায় বেশ বনায়ন হচ্ছে। বিশেষ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের উপর এবং রাস্তার পাশে প্রচুর গাছ লাগান হচ্ছে। জেলায় ইতোমধ্যে অনেক সরকারি ও বেসরকারি নার্সারী গড়ে উঠেছে।

জলবায়ু : বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত এ জেলাও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত থাকে। প্রায় ৮৪% বর্ষণ এ সময় হয়। তবে বর্ষা মৌসুমে কোন কোন মাসে মাত্রাধিক বৃষ্টিপাত হয়। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে, শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এই মৌসুমে আবহাওয়া শুষ্ক ও শীতল থাকে। এখানে নিম্নতম তাপমাত্রা ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পরিলক্ষিত হয়, যার গড় প্রায় ১৮.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টি হয়। শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ১০৮ মি.মি যা ঐ সময়ে বাষ্পীভবনের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জ্বলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে ‘কালবৈশাখী’ বলা হয়। এ সময় কোন কোন বছর কিছু শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : জেলার সর্বত্র বিভিন্ন রকমের দেশীয় গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা। আর জেলার চার দিকে নদী থাকার কারণে অতি সহজে ফসল ও গাছ গাছালি বেড়ে উঠে। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়ীতেই ঝোঁপঝাড়, বাঁশ ঝাড়, কলার ঝাড়, সুপারি গাছ রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যে সকল গাছ রয়েছে এই জেলায়ও সে গুলো দেখা যায়, যেমনঃ আম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, আতা, শরিফা, কামরাঙ্গা, পীতরাজ, শুপারি, নিম, কড়ই, টল্লাবন, হিজল, অরিআম, শিমুল, বিলাতিগাব, পলাশ, পেঁপে, সোনালু, জামবুরা, মান্দার, বট, অশ্বথ, ডুমুর, জারুল, দেশী গাব, সাজনা, খেজুর, দেবদারু, পেয়ারা, রেইনট্রি, জাত করাই, বাবলা, ইপিল ইপিল ইত্যাদি।

এই জেলার প্রধান প্রাণীদের মধ্যে যেমন বানর, মেছো বিড়াল, বাগদাস, খাটাস, গন্ধগোকূল, ছোট বেজী, সাধারণ বড় বেজী, পাতিশিয়াল, উদ্বিড়াল বা উদ বা ধাড়ে, কলাবাদুড়, মধ্যম আকারের বাদুর, ভুয়া রক্ত চোষা বাদুড়, চামচিকা, সজারু, কালো ইঁদুর, বাইট্যা বা নেংটি ইঁদুর, ব্যান্ডীকোটা ইঁদুর, ছোট ব্যান্ডিকোটা ইঁদুর, চিকা, পদ্মা শুশুক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই জেলায় সরিসৃপের মধ্যে দেখা যায় সুন্দি কাছিম, কাউটা কাছিম, মগম কাছিম ও দুরা, টিকটিকি, রক্তচোষা, তক্ষক বা তক্ষণাথ, আর্জিনা, গুইসাপ, দেয়াল টিকটিকি, একচক্র জাতিসাপ, দ্বিচক্র জাতিসাপ, শঙ্খীনি, দুমুখো সাপ, কেউটে, ঢোড়া সাপ, মাইটে সাপ, মাছো রাঙ্গা সাপ, দাড়াস বা ধামন সাপ, লাউডগা সাপ ইত্যাদি।

এই জেলায় বহু পাখ-পাখালী দেখা যায়। পাখীদের মধ্যে রয়েছে ডুবুরী, ছোট পানকৌড়ি বা ছোট পানিকামড়ি, গয়ার বা সাপ পাকি, কর্চি বক বা গুজা বক, মহিষে বক বা গো বক, ডাড় বক বা ধলি বক, মাঝারি বক, চোট বক, নিশাবক বা অক, রঙ্গিলা বা সোন ডঙ্গা, ঘোঙটা বা বাচি চোরা, চামচ মুখি, বুনো রাজহাঁস, ছোট সরাল বা মরাল, বড় সরাল বা মরাল, বামন হাঁস, বালি হাঁস, চখাচখি, শকুন, ভবন চিল, শঙ্খ চিল বা লাল চিল, কোরা ঈগল, সাদা ঈগল, ডাহুক, কোরা, কালো কুট, জলপিপি, লাল হোট টিটি, হলুদ হোটাটিটি, জল চা পাখি, সুচ লেজা চ্যাগা, বাটান, রঙ্গিলা চ্যাগা, পদ্মা জল কবুতর, কালো মাথা জল কবুতর, মাছ খেকো গাঙ চিল, কালচে গাঙ চিল, কপোত বা বুনো কবুতর, সবুজ কবুতর বা হরিয়াল, সবুজ ঘুঘু, লাল ঘুঘু, রাজ ঘুঘু বা ধোরাল ঘুঘু, টিলা ঘুঘু, চোখ গেলো, বউ কথা কও, পাপিয়া, কালো কোকিল, কানা কোয়া, লক্ষ্মী পেঁচা, নিম পেঁচা, ভুতুম পেঁচা, কাঠুরে পেঁচা, যুক্ত পেঁচা,

রাত চরা পাখি, নাককাঠি, আবাবিল, পাকরা মাছরাঙা, সবুজ সুই চোর, নীল কণ্ঠ, হুদ হুদ, বসন্ত বাউরী বা কপার স্মিথ, বড় ভগীরথ, নীলগলা ভগীরথ, মেঠো কুড়ালী বা কাঠ ঠোকরা, সবুজ কুড়ালী, ক্ষুদে সোনলী কুড়ালী, বড় সোনালী কুড়ালী, পূবে আকাশি ভরত, সাধারণ সোয়ালো, বাঘাটিকি, বাদামী কসাই পাখি, কালোমাথা হলদে পাখি বা হলুদিয়া পাখি বা বেনে বউ, কালো ফিঙ্গে, গুবরে মালিক, কাঠ শালিক, ভাত শালিক, ঝুট মালিক, তাড়ুয়া বা হাড়ি চাচা, পাতি কাক, দাঁড় কাক, ক্ষুদে সাত সেলি, ফটিকজল, সিপাহী বুলবুল, বুলবুল, লাল বুক চোটক, সাদা ভুরু বরন বাটা, টুনটুনি, সবুজ পাতা ওয়ার্বলার, বাদামী পাতা ওয়ার্বলার, দোয়েল, সাতেরি, সাত ভাইলা, ধূসর টিট, গেছো পিপিট, সাদা খঞ্জনা, হলুদ মাথা খঞ্জনা, ফুলচুষি, বেগুনী মৌচুষি, বেগুনী পুচ্ছ ভিত্তি মৌচুষি, ছিটামুনিয়া লাল মুনিয়া, বাবুই বা বয়নকারী পাখি, চড়ুই ইত্যাদি।

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : শরীয়তপুর জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। এই জেলার বেশির ভাগ ভূমিই কৃষি আবাদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। জেলায় মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৭৩,৫২০ হে.। জেলায় মোট জমির মধ্যে একফসলী জমি রয়েছে ২২%, দুইফসলী জমি ৫০% এবং তিনফসলী জমি ২৮% (সূত্র : বি.বি.এস., ১৯৯৯)।

প্রধান ফসল : এই জেলার প্রধান ফসল ধান, পাট, গম। জেলায় প্রধানত দুই ধরনের ধান চাষ করা হয়। যেমন দেশী ছিটা আমন ও উচ্চ ফলনশীল বোরো। এ ছাড়াও কিছু কিছু জমিতে কৃষকরা আউশের চাষ করে থাকে। জেলার অন্যান্য ফসলের মধ্যে রয়েছে চিনা, কাউন, আলু, বাদাম, গম, ভূট্টা, সরিষা ইত্যাদি। জেলায় প্রচুর শীতকালীন শাক সবজি জন্মে। যেমন ফুল কপি, বাঁধাকপি, পালং শাক, লাল শাক, মিষ্টি আলু, কুমড়া ও শালগম ইত্যাদি। এই জেলায় অর্থকরী ফসলের মধ্যে আরো রয়েছে পান, সুপারি, খেজুরের গুড় ও কলা। বিশেষ করে জেলার সদর উপজেলাসহ দক্ষিণ অংশের উপজেলাগুলোতে প্রচুর পান চাষ হয়।

মৎস্য সম্পদ : একসময় শরীয়তপুর জেলা মাছে সমৃদ্ধ ছিল। নদ, নদী, খাল, বিল, বাওড় ছিল মাছে পরিপূর্ণ। তবে বর্তমানে বহু নদী, খাল ও বিল ভরাট হয়ে কৃষি জমি হিসেবে চাষ হচ্ছে। ফলে মাছের পরিমাণ খুবই কমে গেছে। এই জেলায় ইলিশ মাছসহ মিঠা পানির অন্যান্য মাছ পাওয়া যায়। যেমন চাপিলা, কাচকি, চিতল, রুই, কাতল, ফলি, শিং, কই, মাগুর, বোয়াল, কোড়াল, ঘনিয়া, কালিবাউস, মৃগেল, শিল, ঘাইড়া, রাঘেক, সরপুটি, চেলাপুটি, তিতপুটি, ফুটনী পুটি, মলা, ছ্যাপ চেলা, গুজি আড়, তলা আড়, গুলসা টেংরা, গুলি টেংরা, বুজুরী টেংড়া, বাতাসি টেংড়া (তিন কাটা), বাচা, পাঙ্গাস, গজার, শোল, মিনি পাবদা, বেলে, টাকি, পোয়া, তাপসি, বাইন, গুটি বাইন, তারা বাইন ইত্যাদি। পুকুরে যে সব মাছের চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে- রুই, কাতল, মৃগেল, গ্রাস কার্প, থাই পুটি, নাইলোটিকা, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, মৃনাল কার্প, সিলভার কার্প ইত্যাদি।

মোট গবাদিপশু র সংখ্যা	১৫৩,৯০৮টি
ঘর প্রতি গবাদিপশু (গড়)	১ টি
মোট ছাগলের সংখ্যা	৮৫,০৫১টি

পশু সম্পদ : জেলায় পশুসম্পদের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। জেলার পশু সম্পদের মধ্যে দেখা যায় হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি। জেলার বেশিরভাগ গৃহস্থই হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল লালন পালন করে থাকে। জেলায় মোট ১,৪৫৩টি ছোট বড় হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে এবং ৫৬টি পশু পালন খামার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৯)।

কৃষি শুমারী ১৯৯৬ অনুসারে দেখা যায় যে শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ৭৪,৩৫১টি গৃহে (যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৪১.১৩%) ১৫৩,৯০৮টি গবাদি পশু রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে গড়ে ১টি করে গবাদি পশু আছে। এ ছাড়া গ্রামীণ ৪৬,৬২৬টি গৃহস্থ ছাগল লালন পালন করে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থের ২৫.৭৯% এবং মোট ছাগলের সংখ্যা ৮৫,০৫১টি। এ ছাড়াও গ্রামীণ গৃহস্থের ৭৫% ঘরে হাস মুরগী লালন পালন করা হয়।

দুর্যোগ

শরীয়তপুর জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। জেলায় বেশ কয়েক ধরনের দুর্যোগ দেখা যায়। যেমন বন্যা, নদী ভাঙন, নদী ভরাট, ফসলী জমিতে বালু ভরাট, ঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি। এ ছাড়াও মানুষের অবিবেচনায় সৃষ্ট কর্মকাণ্ড, অসচেতনতা ও জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা হয়।

নদী ভাঙন : নদী ভাঙনে জেলার হাজার হাজার লোক বসতভিটা ছাড়া হয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। জাজিরা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্ডা উপজেলার অনেক জনবসতি নদীগর্ভে চলে গেছে বা যাচ্ছে। বিশেষ করে জাজিরা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার বহু গ্রাম বিলীন হয়ে গেছে। জাজিরা উপজেলার সব চেয়ে ভাঙনপ্রবন ইউনিয়নগুলো হচ্ছে কুণ্ডের চর, বিলাশপুর, পালের চর, নওডোবা। চরাঞ্চল বেষ্টিত এসব এলাকা প্রতি বছরই নদী ভাঙনের কবলে পরে। ১৯৯৫ সালের পর থেকে কুন্ডের চর ইউনিয়নের ৯ বর্গ কি. মি., নওডোবা ইউনিয়নের ৫ বর্গ কি.মি., বিলাশপুর ইউনিয়নের ৪ বর্গ কি. মি. এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পদ্মা নদীর স্রোতে ভেসে গেছে বিলাশপুর খেজুরতলা রোড, বিলাশপুর বাজার, ৫টি মসজিদ, ৪টি হাট বাজার, ৩টি প্রাইমারি স্কুল এবং ২টি বাসষ্ট্যান্ড।

খাদ্যাভাব/দুর্ভিক্ষ : ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ারের বিবরণ অনুযায়ী ঝড়, অনাবৃষ্টি, খরা, পোকায় ফসলহানি ও বন্যার কারণে শরীয়তপুরসহ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা বহুবার দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। এ সকল দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৬৬, ১৮৯৬, ১৯০৬ ও ১৯৪৩ সালে এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের রেকর্ড আছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারি এ অঞ্চলের মানুষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। ঐ সালে কলেরা ও গুটি বসন্তের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের ফলে বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। প্রাণ রক্ষার তাগিদে বহু মানুষ ঘর বাড়ি এমনকি নিজ পরিবার ও সন্তান সন্ততি ছেড়ে একস্থান হতে অন্যত্র চলে যায়। এ সময়ে সারা বাংলাদেশে প্রায় ২০ হতে ২৫ লাখ লোকের মৃত্যু হয় যার মধ্যে শরীয়তপুরসহ বৃহত্তর ফরিদপুরে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লাখ।

বন্যা : পদ্মা ও তার কয়েকটি শাখা এ জেলাতে এমনভাবে বিস্তৃত যে প্রতি বছরই বন্যার ফলে এ অঞ্চল কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ারে ১৭৮৭, ১৮২৪ ও ১৮৩৮ সালের বন্যায় এ অঞ্চলের মানুষের অস্বাভাবিক ক্ষতির বিবরণ পাওয়া যায়। এসব বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়, বহু গ্রাম ও গবাদি পশু বন্যার তোড়ে ভেসে যায়। এ ছাড়াও ১৮৭০/৭১, ১৯০৭, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৪ ও ১৯৮৪ সালের বন্যায় শরীয়তপুর জেলা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তবে ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয় ১৯৮৮ সালে। মওসুমের প্রায় শেষের দিকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হতেই আরম্ভ হয় বন্যা। একই সাথে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনায় পানি বৃদ্ধির ফলে শরীয়তপুর জেলাসহ সারা বাংলাই বন্যার অথৈ জলে প্লাবিত হয়। সারা শরীয়তপুর জেলায় এমন জায়গা ছিল না যেখানে সরকারি সাহায্যসহ কোন হেলিকপ্টার অবতরণ করতে পারতো। সমস্ত রাস্তাঘাট বুক পরিমাণ পানিতে ডুবে যায়। প্রায় ৯৫% ঘরের মধ্য দিয়ে পানি স্রোত প্রবাহিত হয়। জনসাধারণকে ঘরের চালে এবং মাচা পেতে অতি কষ্টে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। বহু শিশুর প্রাণহানি ঘটে, গরু বাছুর পানিতে ভেসে যায়, স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে এবং প্রায় সব ফসলের নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় সকল পুল ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৯৮ সালের বন্যাও এ জেলায় আঘাত হানে। বিগত ২০০৪ সালের বন্যায় জেলার জনপদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

পরিবেশ দূষণ : মানুষের অসচেতনতা-অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, গৃহস্থালির বর্জ্যসহ বিভিন্ন শিল্প কল কারখানার বর্জ্য পদার্থ জেলার সামগ্রিক পরিবেশ দুষণে প্রভাব ফেলছে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : নদী-নালা ও মোহনায় মাছের প্রাচুর্য অনেকাংশেই কমে গেছে অত্যধিক ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার কারণে। এ ছাড়া অপরিকল্পিত নদী শাসনের ফলে নদী-নালা ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় মাছের বহু প্রজাতিই আজ বিলুপ্ত হবার পথে।

বিপদাপন্নতা

ক্ষুদ্র কৃষক	**:**	**আর্সেনিক, নদীভাঙন, অর্থের অভাব, কৃষি উপকরণের অভাব, কাজের অভাব**
জেলে	**:**	**নদীভাঙন, জোয়ার, জলোচ্ছাস, বাজারদর**
গ্রামীণ মজুরী শ্রমিক	**:**	**অর্থের অভাব, বাজারদর, ঋণ, আর্সেনিক, নদীভাঙন**
শহরে মজুরী শ্রমিক	**:**	**আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি, মধ্যসত্ত্বভোগী, কাজের অভাব, নদীভাঙন**

জেলার প্রধান জীবিকা দল যেমন ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিক। এদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৩)-য় দেখা গেছে, জেলার সব ক'টি জীবিকা দলের মধ্যে বন্যা ও নদীভাঙনের প্রভাব অপরিসীম। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সব ক'টি জীবিকা দল কম বেশি বিপদাপন্ন। জেলার ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন ও জীবিকায় আর্সেনিক, বন্যা, নদীভাঙন, অর্থের অভাব, কৃষি উপকরণের অভাব, কাজের অভাব ইত্যাদি প্রধান দুর্যোগ। জেলে ও কৃষকদের জীবনের প্রধান ক'টি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপদাপন্নতা হল নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার, বাজারদর ইত্যাদি। জেলেদের দৈন্যদশার কারণ হল দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অর্থাভাব, মহাজনী বা দাদন ব্যবসা ইত্যাদি। তবে গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে তাদের কাজের অভাব, মজুরি শোষণ, ভগ্ন বা রুগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব, আয়ের উৎস কমে যাওয়া ইত্যাদি। বসবাসের জায়গার অভাবসহ কাজের অভাব, জলাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শহরের দিনমজুর বা শ্রমিকদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

শরীয়তপুর জেলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ১১ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৫.৪৩ লাখ এবং নারী ৫.৩৭ লাখ। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০% গ্রামে বসবাস করে এবং ১০% শহরে বসবাস করে। শরীয়তপুর ঘনবসতিপূর্ণ জেলা। প্রতি বর্গ কি.মিটারে ৯১৪ জন লোক বাস করে (বি.বি.এস., ২০০৩)। যেখানে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতি বর্গ কি.মিটারে ৭৪৩ জন এবং বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মিটারে ৮৩৯ বাস করে।

মোট জনসংখ্যা (লাখ)	১১
পুরুষ	৫.৪৩
নারী	৫.৩৭
মোট গৃহস্থালির সংখ্যা (লাখ)	২.১৩
শহুরে	০.০২
গ্রামীণ	১.৯৪
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ)	৯১৪
গৃহ প্রতি গড় জনসংখ্যা	৫.১
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির %)	৫.৫৭
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৫৮

জেলায় ০-১৪ ও ৬০+ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতা অনুপাত ১.১৩।

ঘর-গৃহস্থালি : শহুরে (.১৯ লাখ) ও গ্রামীণ (১.৯৩ লাখ) মিলিয়ে শরীয়তপুরে মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ২.১৩ লাখ। পরিবারের জনসংখ্যা গড়ে ৫.১ জন। শরীয়তপুর জেলায় ঘরের ছাদের ৩৯% ছোন, বাঁশ, পাটকাঠী ও পলিথিন দিয়ে তৈরি ও ৬১% ঘর ঢেউটিন বা টালীর তৈরি। আবার এ সব ঘরের মধ্যে ৬৭% বেড়া পাটকাঠী ও বাঁশের এবং ৩১% বেড়া টিনের। অন্যদিকে মাটি, দেশীয় ইট, কাঠ ও পাকা দেয়ালের বেড়া খুবই সামান্য।

ঘরের ছাদ	
ছোন, বাশ, পাটকাঠী পলিথিন	৩৯%
ঢেউটিন/টালীর	৬১%
ঘরের দেয়াল	
পাট কাঠীর, বাঁশের তৈরি	৬৭%
টিনের	৩১%

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলায় সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নেই। জেলায় সরকারি জেনারেল হাসপাতাল ১টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৬টি, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১২টি, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৩৩টি, মাতৃ ও শিশু কেন্দ্র ১টি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ১টি, দাতব্য ডিসপেনসারি ৫টি আছে। জেলার হাসপাতালগুলোতে ৪,৮৭৫ জন লোকের জন্য একটি শয্যা রয়েছে। জেলার ৭২% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার রয়েছে।

জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেপটিক আলসার, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি।

শিশু স্বাস্থ্য : এ জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৮ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৬ (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। জেলায় ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৮% শিশুই অপুষ্টির শিকার। এ পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে হাম, ডিপিটি, পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৬২%, ৬৩%, ৮২% শিশু। এ ছাড়া ৪৩% শিশু ORT নিয়েছে (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : জেলার ৩৬% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৫৬% ঘরে কাঁচা পায়খানা আছে এবং ৮% ঘরে কোন রকম পায়খানা নেই। শহরে এবং গ্রামের পয়ঃসুবিধার পার্থক্য স্পষ্ট। শহরে ৭৮% ঘরে পাকা, ১৫% ঘরে কাঁচা লেট্রিন আছে, ৭% ঘরে কোন লেট্রিন নেই । গ্রাম এলাকায় ৩২% ঘরে পাকা, ৬০% ঘরে কাঁচা লেট্রিন ব্যবহার করে, ৮% কোন ঘরে কোন লেট্রিন নেই।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৯২% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে, বাকী ৮% পানি অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। শরীয়তপুরে ৬৫% নলকূপে প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক রয়েছে।

শিক্ষা

জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক নয়। সাত বছরের উপরে যে জনসংখ্যা রয়েছে তাদের সাক্ষরতা প্রায় ৩৮% (বি.বি.এস., ২০০২)। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের সাক্ষরতার হার ৪১%; এর মধ্যে পুরুষ ৪৭% এবং নারী ৩৬% (বি.বি.এস., ২০০৩)।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জেলায় প্রাথমিক স্কুল রয়েছে মোট ৭৭২টি। এর মধ্যে সরকারি ৩১৭টি এবং বাকি সব বেসরকারি ও অন্যান্য স্কুল। মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সরকারি স্কুলে ১,১০,১৪২ জন এবং বেসরকারি স্কুলের ৫৩,৮৮৭ জন। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় ১৯টি স্কুল রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫,৩৫৯ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৬৪ জন। জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল রয়েছে ৮৩টি। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৮,৬৪৯ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ১৩৬১ জন।

সাক্ষরতার হার (৭$^+$)	৩৮%
প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতার হার (১৫$^+$)	৪১%
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	১৯
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	৮৩
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	১৬
মাদ্রাসা	৪২
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৭২
সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	৩১৭
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	১,১০,১৪২

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মোট ১৬টি কলেজ রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭,১৬৬ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা যথাক্রমে ৩০১ এবং ৩৪ জন।

এ ছাড়া শরীয়তপুর জেলায় ৪২টি বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৮,২৮৪ জন এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৪,৫৮৬ জন ছাত্রীর সংখ্যা ৩,৬৯৮ জন।

সামাজিক উন্নয়ন

শরীয়তপুর জেলায় (৭$^+$ বছর) সাক্ষরতার হার ৩৮%, নিরাপদ পানি সুবিধা ৯২%, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৩৬%। শিক্ষার হার, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিভিন্ন দিক থেকে আগাতে পারেনি।

সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	৩৮%
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৯২%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৩৬%
শয্যা প্রতি জনসংখ্যা	৪,৮৭৫ জন

প্রধান জীবিকা দল

কৃষিনির্ভর এ জেলার প্রধান ফসল ধান। জেলার মোট পরিবারের জনসংখ্যার ৪৭% কৃষিজীবী, ২৩% কৃষি শ্রমিক, ১% মৎস্যজীবী, ৩% দৈনিক শ্রমিক, ১০% ব্যবসায়ী, ৫% চাকরিজীবী, ১১% অন্যান্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন প্রমত্তা পদ্মা, মেঘনা, আরিয়ালখাঁর নদী ভাঙন, বন্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমাবনতি, ভূমিহীনতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। চাষের জমি ক্রমবিভাজনের ফলে একটি পরিবার কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারছে না। তাই কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ এবং শ্রম বিক্রির জন্য বিভিন্ন

শহরে বা বন্দরে যাচ্ছে (সূত্র : বাংলা পিডিয়া)। জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক, শহুরে শ্রমিক, ও মৎস্যজীবী। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের চাষাবাদ করে মানুষ সংসার চালায় যেমন শাক-সবজি, কলা ইত্যাদি।

কৃষক : শরীয়তপুর জেলায় গ্রামীণ কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১৪৬,২০৫। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১২৩,৯৭৩ (৬৫.৬%); মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০-৭.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ২০,১৫৪ (১০.৭%) এবং বড় কৃষক (৭.৫০+ একর) পরিবারের সংখ্যা ২,০৭৮ (১.১%)।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে, আবার পরিবার বিভাজনের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকে। জেলার মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ১৮৯০৫৬টি, যা মোট গ্রামীণ পরিবারের ২৬%।

শহুরে শ্রমিক : বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত শরীয়তপুর শহরেও শ্রমিক সংখ্যা বেড়েই চলছে। গ্রাম এলাকায় যথাযথ আয়ের উৎসের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীন মানুষ শহরে ভীড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এরা কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, পরিবহন শ্রমিক, যোগালী হিসেবে কাজ করে। তবে জেলায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা কম। একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন, অন্যদিকে শিক্ষার হার বেশি থাকার ফলে বড় শহরে গিয়ে এরা গার্মেন্টস শিল্পে ও বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করে।

জেলে : জেলায় জেলেদের সংখ্যাও অনেক। এরা সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রমের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে থাকে। গ্রীষ্ম আসার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক মাছ ধরতে নদীতে যায়। এরা বছরের মে মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নদীতে মাছ ধরে। আবার অনেক পরিবার সারা বছর মাছ ধরে। জেলার ১০,০০০ পরিবার মাছ ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ এই সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শরীয়তপুরে সক্রিয় শ্রম জনশক্তির সংখ্যা ৫৪৩ হাজার। এর মধ্যে ৫৫% পুরুষ এবং ৪৫% নারী। ১৯৯৫-৯৬ সালে জনশক্তি ছিল ৫২৫ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ৫৯%, ৪১% (বি.বি.এস., ২০০০)। জেলায় মাথাপিছু আয় ১২,৯৩৬ টাকা জাতীয় আয়ের (১৮,২৬৯ টাকা) চেয়ে অনেক কম (বি.বি.এস., ২০০২)। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৭৪ হেক্টর এবং জেলায় প্রথম শ্রেণীর চাষযোগ্য প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য পাঁচ হাজার ছয় শত টাকা (সূত্র : বাংলা পিডিয়া, মার্চ ২০০৩)।

মাথাপিছু আয়	১২,৯৩৬ টাকা
মোট শিল্পে আয়	১৭%
স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৫.৪%
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন খানা	১০%

দারিদ্র্য

এই জেলায় অধিকাংশ লোক কৃষি নির্ভর। আর প্রধান ফসল হচ্ছে ধান। এ ছাড়াও রয়েছে কলা, পান, সবজি, ইক্ষু ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রকৃতি নির্ভর

দরিদ্র	৪৪%
অতি দরিদ্র	২১%
ভুমিহীন	৪৭%
ক্ষুদ্র কৃষক	৬৬%

তাই যখনই কোন দুর্যোগ আসে তখন এই সব ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকরা পরে দূরবস্থায়। আর এই ক্ষতির পরিমাণ ২-৩ বছরেও কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে বহু কৃষক দিন দিন দারিদ্র্যের মধ্যে চলে যায়। এ ছাড়াও নদী ভাঙনের ফলেও ধীরে ধীরে বহু পরিবার নীরবে দারিদ্র্যের মধ্যে প্রবেশ করছে। শরীয়তপুর জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৪% দরিদ্র এবং ২১% অতি দরিদ্র। এ ছাড়া জেলার মোট গ্রামীণ পরিবারের ৪৭% ভূমিহীন এবং ৬৬% ক্ষুদ্র কৃষক (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শরীয়তপুর জেলার নারীদের অবস্থান ইতিবাচক। সম্প্রতি সি.পি.ডি.-ইউ.এন.এফ.পি.এ. বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় শরীয়তপুর জেলা "স্বল্পমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য - এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক বন্ধন ও শিক্ষা নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন আনছে। নারীদের অবস্থানকে তথাকথিত কঠোর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে উন্নয়নের অংশীদার করে নেয়ার সময় এসেছে।

লিঙ্গ অনুপাত : শরীয়তপুরে মোট জনসংখ্যার ৪৯.৭২% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত অনুপাত ১০০:১০১.১। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৯। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৮৮ (বি.বি.এস., ২০০৩)।

বৈবাহিক অবস্থান : শরীয়তপুরের ৩১% নারী বিবাহিত এবং ৩% নারী বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধণের হার ৮৬% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙনে স্বর্বস্ব হারিয়ে এবং আর্থ-সামাজিক কারণে শরীয়তপুরে নারীরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে।

প্রজনন স্বাস্থ্য : জেলার নারীদের প্রজনন হার ২.৬৩ (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ২টির বেশি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৮ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি।

- **জেলায় নারী-পুরুষের অনুপাত ১০০:১০১.১।**
- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৬, জাতীয় (৯২) তুলনায় বেশি।**
- **নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩৫%, যা জাতীয় (৪১) হারের তুলনায় কম।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার ৮৬, যা জাতীয় হারের তুলনায় কম।**
- **জেলায় ১৫-৪৯ বয়সদলের ২৫% নারী খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) তুলনায় কম।**
- **জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৮%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।**
- **জেলায় সক্রিয় জনশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ (৪৫%), যা জাতীয় হারের (৩৭%) চেয়ে বেশি।**
- **জেলার মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪জন, যা জাতীয় (৫ জন) হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় প্রায় সমান (৫জন)।**

পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪জন, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। জেলার ১৩-৪৯ বয়স দলের মোট ৩৮% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন এ জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা, এনজিওগুলোর সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

শ্রমশক্তি : শরীয়তপুরের নারীদের মধ্যে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির হার ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কর্মক্ষম শ্রম শক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগণের ৪১% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে বেড়ে হয়েছে ৪৫%, যারা সকলেই গ্রামের। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, তারা সেই চিরায়ত ধ্যান ধারণা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর তাই গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয় (বি.বি.এস., ১৯৯৯)। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২৫% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : শরীয়তপুরে নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা নারীর স্বাস্থ্যদশাকে সার্বিকভাবে দুর্বল করেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ১৩%, যা জাতীয় হারের তুলনায় অনেক বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৭% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ৮৩% ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন। মাত্র ১০% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৭% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শিক্ষা : জেলার ৭$^{+}$ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩৫% এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার ৩৬%। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শরীয়তপুরের মেয়েরা এগিয়ে আছে। মোট ছাত্রছাত্রীর ৪৯% মেয়ে, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ৮৬%। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর ৫১% ছাত্রী এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীর ৪৭% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। ৪৪% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে। অর্থাৎ শরীয়তপুর জেলার নারীদের উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ কম।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

শরীয়তপুর জেলায় ৯৫০ কি.মি. রাস্তা রয়েছে। ৩৭ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক, ১২৪ কি.মি. ফিডার রোড -এ, ৭৫ কি.মি. ফিডার রোড -বি, এবং ৩৭৮ কি.মি. গ্রামীণ -১, ও ৩৩৬ কি.মি. গ্রামীণ -২ ধরনের রাস্তা রয়েছে।

জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৯৩ কি.মি./ বর্গ কি.মি.। যদিও এই হার উপকূলীয় অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু রাস্তাঘাটের অবস্থা বেশি ভাল নয়। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আশু উন্নতি খুবই প্রয়োজন। কেননা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এলাকার মানুষ একদিকে যেমন মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষিসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ এবং বাজারজাত করতে না পারায় জেলার অর্থনীতি দুর্বল থেকে যাচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম। তাই জেলার রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ঘটলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যোগাযোগ সুবিধার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করার সুবিধা পাবে।

নৌ-পথ

এই জেলায় ৬৬৩ কি.মি. নদী রয়েছে। যেখানে জোয়ার-ভাটা হয় এবং নৌ চলাচল করে, যা একদিকে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা আবার পরিবহন ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খুবই জরুরি।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা ও ভোগ্যপণ্য বিস্তারের কারণে জেলায় হাটবাজার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জেলায় ৮৮টি হাটবাজার এবং ১২টি মেলা রয়েছে। জেলার বেশিরভাগ পণ্য এবং পরিবহন হয় নৌপথে। নিম্ন আয়ের লোকেরা চলাচল করে নৌপথে আবার অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে নদীপথ ছাড়া উপায়ও থাকে না, তাই বেশিরভাগ লোক নৌপথ ব্যবহার করে।

শরীয়তপুর জেলায় ১০টি লঞ্চ ঘাট এবং ১টি ফেরী ঘাট রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌ চলাচলের জন্য এই ঘাটগুলো গড়ে উঠেছে। এই বন্দরগুলোতে আভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচল করা, বড় লঞ্চ, ছোট লঞ্চ এবং যন্ত্রচালিত নৌকায় লোক এবং মালামাল উঠানামা করে।

উল্লেখ্য, এই বন্দরগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বড় হাটবাজার ও মোকাম। এসব বন্দরের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়লে জেলা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই জেলার বাসস্ট্যান্ডগুলো থেকে প্রতিদিন দূরপাল্লার বাস চলাচল করে।

হাটবাজারের খতিয়ান

উপজেলা	হাট বাজারের সংখ্যা
শরীয়তপুর সদর	৭
ভেদরগঞ্জ	২৩
ডামুড্ডা	৯
গোসাইরহাট	১১
নড়িয়া	২২
জাজিরা	১৬
মোট	৮৮

বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ২১,০৮০টি পরিবারকে বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছে। এর মধ্যে শহরের ৭,৩০০ টি পরিবারকে এবং পল্লীতে ১৩,৭৮০ টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। এ জেলার সব উপজেলার সাথেই ঢাকা বা অন্যান্য জায়গার আধুনিক টেলিফোনের যোগাযোগ রয়েছে।

শিল্পাঞ্চল

এই জেলায় শিল্প কারখানা তেমন গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে এ জেলায় ১৬৪টি চাউলের কল, ১১২টি আটার কল ও ৪টি ময়দার কল রয়েছে। জেলায় বর্তমানে ১৩টি বরফকল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও ৩টি তেলের কল রয়েছে।

সেচ ও গুদাম

জেলার কৃষিজীবী লোকেরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী - দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এখানে আধুনিক সেচ প্রযুক্তি বলতে নলকূপ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, এলএলপি পাম্প ইত্যাদিকে বুঝায়। এলএলপি দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয় এবং পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে চাষ দেয়া হয়। এই জেলায় ১,৬৩৭টি এলএলপি ও ৯৮০টি স্যালো টিউবওয়েল এবং ২টি গভীর নলকূপ দিয়ে মোট ২৩,১৫০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হয়।

জেলায় বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণের সুবিধা রয়েছে। বি.বি.এস (১৯৯৮)-এর তথ্য অনুসারে এই জেলায় মোট ২৪টি খাদ্য গুদাম রয়েছে, এই গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা মোট ২৫,০০০ মে.টন। ১টি বীজ গুদাম রয়েছে, যার ধারণ ক্ষমতা ১০০ মে.টন এবং ১টি সার গুদাম রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে শরীয়তপুর জেলায় সরকারি মোট ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে যে সব প্রকল্প কেবল ২০০৪ সালের জুন মাসের পরে চালু আছে ও থাকবে তাদের হিসেব তুলে ধরা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্প সংখ্যা
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	২
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড	১
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। এসব প্রকল্পে যে সব উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহযোগিতা করছে সেগুলো হচ্ছে জেবিআইসি (JBIC), ডিএফআইডি (DFID), আইডিএ (IDA), জিইএফ (GEF), আই.ডিবি (IDB), ডানিডা (DANIDA), নোরাড, ইউনিসেফ, ইত্যাদি।

এই জেলায় স্থানীয় বেশ কিছু এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ সহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জাতীয় NGO এই জেলায় কাজ করছে যেমন BRAC, PROSHIKA, ASA, নিজেরা করি। জেলার মোট ২৮% গৃহস্থ এই এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ ৬,৪১৮ টাকা মাত্র (আইসিজেডএম, ২০০৩)। এ ছাড়া জেলার দুস্থদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ সেবা অধিদফতর এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কাজ করছে।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গৃহস্থ (জন)	৫৮,৬৬১
% গৃহস্থ (মোট)	২৮%
মোট ঋণের পরিমান (কোটি টাকা)	৩৭.৬৫
গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমান (হাজার টাকা)	৬,৪১৮

হোটেল অবকাশ কেন্দ্র

জেলা সদরে একটি সার্কিট হাউজ ও একটি ডাকবাংলো রয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডাকবাংলো রয়েছে।

পদ্মার ভাঙন রোধে নেই কোন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

শরীয়তপুর জেলায় ১২ হাজার ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায় না

Rampant toll collections in Shariatpur alleged

No reliefs reach char lands in Bhedarganj

Jhatka catch going on unabated in Shariatpur

ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে শরীয়তপুরে ৪ জনের মৃত্যু

Pry edn suffers setback in Shariatpur

Dropouts from pry schools on rise due to object poverty

শরীয়তপুরের তুলাসার আশ্রয়কেন্দ্র

‘ভাত চায়, মারছি, কানতে কানতে ঘুমাইয়া পড়ছে, উঠলে কী দিমু?’

Shortfall, huge loss apprehended

Pest attack Boro seedlings, betel-leafs in Shariatpur

শরীয়তপুরে দুটি স্কুল নদীগর্ভে

শরীয়তপুর জেলা কারাগারে পানি

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

শরীয়তপুর জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং মানুষের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

পরিবেশগত সমস্যা
- বন্যা
- নদী ভাঙন
- জলাবদ্ধতা
- জীব বৈচিত্র্য হ্রাস

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- কুটির শিল্পের বিলুপ্তি
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- কাজের অভাব
- বাজারদর

কৃষি বিষয়ক সমস্যা
- কৃষি উপকরণের অভাব
- পঙ্গপালের (পামুরি) আক্রমণ
- বাজারজাতকরন বা সংরক্ষণের অভাব

পরিবেশগত সমস্যা

বন্যা : শরীয়তপুর জেলায় বন্যা হচ্ছে উন্নয়নের মূল সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা। জেলার আপদকালীন নিরাপত্তার অভাব ও অপর্যাপ্ত সতর্ক সংকেত ব্যবস্থার কারণে বন্যায় জেলার মানুষের ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন হয়। বন্যার পূর্বে জনসাধারণের ও তাদের সম্পদ নিরাপদ স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা অপ্রতুল। বিশেষ করে এই জেলার চরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। এ ছাড়াও বন্যার সময় তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই।

নদী ভাঙন : সাম্প্রতিক সময়ে শরীয়তপুর জেলায় পদ্মা নদীর ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই ভাঙন প্রতিরোধের কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও নেই। নদী ভাঙন জেলার প্রধানতম সমস্যা ও সার্বিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। জাজিরা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলাগুলো নদী ভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ১৯৯৫ সালের পর থেকে নদী ভাঙন প্রকট রুপ ধারণ করে।

নদী ভাঙনের ফলে জেলার বহু কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে এখন শহরমুখি হচ্ছে এবং রিক্সা চালক ও দিন মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছে।

জলাবদ্ধতা : এই জেলায় গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট খালগুলোর মুখ পলি পরে জমির চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে, যার ফলে ভরা জোয়ারে পানি উঠলে আর নামতে পারে না। আবার অতি বৃষ্টির সময়ও জমিতে পানি জমে ফসলের ক্ষতি হয়। এ ছাড়া গ্রামে অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ করার ফলেও জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

জীব বৈচিত্র্য হ্রাস : এই জেলার কিছু মাছ ছিল, যা মিঠা এবং লবণ পানি উভয়ের মধ্যে পাওয়া যেত যেমন তাপসী, পোয়া, গুলসা ট্যাংরা, চাপিলা ইত্যাদি। এ সব মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া অনেক মিঠা পানির মাছ যেমন সরপুটি, পাবদা, বাইলা, ফলি ইত্যাদি দিনে দিনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

কৃষি বিষয়ক সমস্যা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পঙ্গপালের (পামুরি) আক্রমণ, উন্নতজাতের বীজ সরবরাহের অভাব, ফসল রক্ষাকারী বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও মিঠা পানি সংরক্ষণের অভাবে এই জেলার কৃষিকাজ ব্যাহত হয়।

কৃষি উপকরণের অভাব : জেলার কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠা সনাতনী পদ্ধতির। আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী সেচ প্রযুক্তির অভাব, উন্নতজাতের বীজ সারের অভাবে শস্য ও ফলজ কৃষির ফলন কম হচ্ছে। এখানে কৃষকরা কৃষি তথ্য ও সুপরামর্শ থেকে বঞ্চিত।

পঙ্গপালের (পামুরি) আক্রমণ : পঙ্গপালের বা পামুরি পোকার আক্রমণে প্রায় প্রতি বছরই ফসল (রোপা আমন, আউশ, বোরো ধান) ধ্বংস হয়। কৃষকরা চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে।

বাজারজাতকরন বা সংরক্ষণের অভাব : বাজারজাতকরন বা সংরক্ষণের অভাবে ফলজ কৃষি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা হতাশ হয়ে পড়ছে। এছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কৃষকরা তাদের প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেননা প্রকৃত মূল্যের এক বিরাট অংশ এই ফড়িয়া বা আড়তদাররা নিয়ে নেয়।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

কুটির শিল্পের বিলুপ্তি : জেলায় বেশ কিছু কুটির শিল্প রয়েছে যেমন মৃৎ শিল্প, পাপোষ, কাঠের তৈরি তৈজসপত্র, কামার ও স্বর্ণকার । অর্থ এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে এরা দিন দিন পেশা পরিবর্তন করছে।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য কৃষকরা তাদের ফসল বাজারজাত করতে পারে না। অন্য জেলা থেকে মালামাল আনা-নেয়া করায় প্রচুর সময় নষ্ট হয়।

কাজের অভাব : শরীয়তপুর জেলায় কাজের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদী ভাঙনে সবকিছু খুইয়ে মানুষ আর্থিক কষ্টের শিকার। তাই তারা নিরন্তর কাজ খোঁজে। কাজ জুটলেও মজুরি পায় সামান্য। তাই মানুষ অভাব অনটন, ধার-দেনা, সুদে টাকা ধার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে দিন কাটায়। উল্লেখ্য, বন্যা ও কৃষিখাতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার দরুন কৃষকরা চরম অর্থকষ্টে ও কাজের অভাবের মধ্যে দিনানিপাত করছে। কর্মহীন হয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়।

বাজারদর : ফসলের (রোপা আমন, আউশ, বোরো ধান) ব্যাপক উৎপাদন ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির কারণে চাষীরা অতি অল্প দামে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে। এ ছাড়া বাজারে ফসলের দরের ওঠা-নামা চাষী ও জেলেদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত সংকট সৃষ্টি করছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রম অবনতি আজকের শরীয়তপুরবাসীর জীবনের একটি চরম দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, জমি দখল, ফসল ও মাছ হরণ, বসতি উচ্ছেদসহ নারী নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন দরকার। বিশেষ করে গ্রামে, গঞ্জে, বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দরকার। সেই সাথে জেলার একটা বিরাট অংশ নৌপথ। এই নৌপথও নিরাপদ করা একান্ত প্রয়োজন।

Nursery business gains popularity in Shariatpur

জমাইন্না বীজ বুনছিলাম...

Jobless youths being attracted to poultry farming in Shariatpur

Bamboo-based cottage industry faces extinction

কৃষকদের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিল নড়িয়ার 'চিশতিনগর সেচ প্রকল্প'

Uplift projects for educational institutions being executed

সম্ভাবনা ও সুযোগ

কৃষি ও মৎস্য সম্পদে সম্ভাবনাময় জেলা শরীয়তপুর। জেলা ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের গণমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন কৃষি ও অর্থনীতি, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পাঞ্চল স্থাপন করা গেলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি।

কৃষি ও অর্থনীতি

কৃষি ও অর্থনীতি
- কৃষি উন্নয়ন
- রবি শস্য
- পাইকারী বাজার
- কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প
- মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- বনজ সম্পদ
- ভূমি ব্যবহার

শিল্প উন্নয়ন
- ব্যক্তি খাত
- ব্যবসা-বাণিজ্য
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- শিল্পাঞ্চল

কৃষি উন্নয়ন : উন্নত এবং সময়োপযোগী বীজ, সার, সেচ সুবিধা ও ফসল সংরক্ষণের সহযোগিতা নিশ্চিত করা গেলে কৃষির উন্নয়ন সম্ভব। খাল বিল সংরক্ষণ ও সংস্কার করে কৃষির উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতি হতে পারে। দুর্যোগ থেকে কৃষকদের সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করবে।

রবি শস্য : এই জেলার চর এলাকায় প্রচুর রবি শস্যের চাষ হয়। যেমন শীতকালীন শাক সবজিসহ বিভিন্ন রকমের ডাল, তেলবীজ, ছোলা আলু, মিষ্টি আলু, শাক সবজি, মরিচ ইত্যাদি। এসব ফসলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে আরেকটি সম্ভাবনা।

পাইকারী বাজার : এই জেলায় বেশ কিছু পাইকারী বাজার রয়েছে। যেমন আঙ্গারীয়, জাজিরা, লাউখোলা, ভোজেস্বর, নড়িয়া, পালং, ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যা ইত্যাদি। এই সব বাজারে উৎপাদিত ফসল ও পণ্য দ্রব্যের ব্যাপক কেনা বেচা হয়।

কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প : এই জেলায় প্রচুর শীতকালীন শাক সবজি জন্মে। যেমন ছোলা, আলু, মিষ্টি আলু, ফুল কপি, বাঁধা কপি, গাজর, পিয়াজ ও রসুন - যা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে পারে।

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা : সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জেলার মৎস্য সম্পদ একটি বড় অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা : নল বন, হোগলা বন, কাঁশ বন এবং বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা গেলে জেলার ফসল, সম্পদ, নদী-নালা ও ভূমি রক্ষা পাবে।

বনজ সম্পদ : জেলায় বনজ সম্পদ উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে সরকারি খাস জমি বা চর এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণমূলক বনায়ন করা সম্ভব।

ভূমি ব্যবহার : স্থানীয় জনগণ এবং সরকারিভাবে যৌথ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি থাকলে চাষাবাদে সুবিধা হয়। কারণ পরিকল্পনামাফিক জমি ব্যবহার করলে জমির সম্পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সেই সাথে জমির উর্বরতাও রক্ষা হয়।

শিল্প উন্নয়ন

ব্যক্তি খাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তি খাতে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প এবং বেশ কিছু লবণ ফ্যাক্টরি ও বরফকল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বহু বছর পূর্ব থেকে চাল ভাঙ্গার কল, পাপোষ, কার্পেট, স-মিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ আর্থিক সহযোগিতা করলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

ব্যবসা-বাণিজ্য : জেলায় কৃষিনির্ভরতার কারণে কৃষি বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠা সম্ভব। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন গোডাউন, বিদ্যুতায়ন, জেটি এবং অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করে দেশের বাজারে স্থানীয় পণ্য পৌছানো নিশ্চিত করতে পারলে এই জেলার বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি শক্ত হবে।

শিল্পাঞ্চল : ভৌগোলিক কারণে এই জেলায় শিল্প কারখানা তেমন গড়ে উঠেনি; কিন্তু এই জেলায় শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন এই জেলায় প্রচুর জনশক্তি ও ধনী ব্যক্তি রয়েছে। সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ ও ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা বিধান করা গেলে এই জেলায় ও প্রতিটি উপজেলায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারে। এই জেলায় বহু ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিক রয়েছেন, যারা ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা স্থাপন করেছেন। এই সকল ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিকদের সরকারিভাবে উৎসাহিত করে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে এই জেলায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠা সম্ভব, যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

শরীয়তপুর জেলায় ২০০১ সালে জনসংখ্যা ১০.৮০ লাখ থেকে ২০১৫ সালে প্রায় ১৩ লাখ, ২০৫০ সালে ১৭ লাখের উপর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাত্র ১৫ বছরে লোকসংখ্যা বাড়বে ১৯২৯০০ জন।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর ২০১৫ সাল। এই সালে শরীয়তপুর জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হতে পারে প্রায় ১২.৭৩ লাখ। এর মধ্যে পুরুষ প্রায় ৬.৩৭ লাখ, নারী প্রায় ৬.৩৬ লাখ। তাদের মধ্যে শহরে বাস করবে প্রায় ১.৬ লাখ ও গ্রামে বাস করবে প্রায় ১১.১০ লাখ। ২০৫০ সালে জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৭.৪৪ লাখ, পুরুষ ও নারী যথাক্রমে হবে ৮.৭২ লাখ ও ৮.৭২ লাখ। এদের মধ্যে শহরে বাস করবে প্রায় ৪.০৪ লাখ এবং গ্রামে বাস করবে প্রায় ১৩.৩৯ লাখ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানা পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগান যায় তা হল, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, উন্নত কৃষি ব্যবস্থা, চিংড়ি চাষ, উন্নতমানের হাঁস-মুরগির খামার, মাছ চাষ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। সে সাথে যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে তা হল বাণিজ্যে প্রসার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও হাটবাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

জেলার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এই জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর জেলার ভৌগোলিক দূরত্ব খুবই কম। বিশেষ করে বর্তমানে নৌপথে পদ্মা-মেঘনা অতিক্রম করলেই উৎপাদিত পণ্য ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলায় সরবরাহ করা সহজ।

আবার জেলার সাথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে নৌপথে যোগাযোগ খুবই স্বল্প ব্যয়ের। তাই অতি সহজে জেলায় উৎপাদিত রবি ফসল যেমন আলু, সরিষা, মিষ্টি আলু, শীতকালীন সবজি, পান, গুর, পাট দেশের অন্যত্র বাজারজাত করা যায়। এ ছাড়াও পদ্মা সেতু নির্মিত হলে এই জেলার সাথে সারা দেশের দূরত্ব কমে আসবে। রাস্তাঘাটের উন্নয়নের মাধ্যমে জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন হবে।

দর্শনীয় স্থান

শরীয়তপুর জেলায় বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটির বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো।

ধানুকা : চন্দ্রমনি ন্যায় ভুবন হরচন্দ্র চূড়ামনি ও মহা মহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায় প্রভৃতির জন্মস্থান ধানুকায়। এখানকার শ্যামমূর্তি জাগ্রত দেবতা বলে কিংবদন্তী রয়েছে।

কুরাশি : রাজা রাজবল্লভের বংশধরগণের কেউ কেউ এখানে বাস করেন বলে জানা যায়। বেশ কয়েকটি মন্দির ও শিবলিঙ্গ মূর্তি এখানে রয়েছে।

রাজগঞ্জ : পান চাষের প্রসিদ্ধ স্থান। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার জ্ঞানচন্দ্র বাগচীর জন্মস্থান।

মহিষার : দক্ষিণ বিক্রমপুরের এককালীন প্রখ্যাত স্থান। চাঁদরায়, কেদার রায়ের নির্দেশে এখানে পানীয় জলের জন্য কয়েকটি দিঘী খনন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ হতে এখানে এক সপ্তাহর জন্য মেলা হয়। দিগম্বরী সন্ন্যাসীর মন্দিরও এখানে রয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ ন্যায় রত্নের বাসস্থান।

লাকার্তা : লাকার্তা গ্রামে কিছু পুরাতন ইমারত রয়েছে যা অন্তত দুইশত বছরের স্মৃতি বহন করে।

কনেশ্বর : জমিদার শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাসস্থান।

হাটুরিয়া : এককালে স্টিমার স্টেশন ছিল। এখানকার কালিবাড়ী ও সখালুতলার দুর্গা প্রসিদ্ধ। এখানে কোলকাতার ঠাকুর বংশীয় জমিদার কালী কৃষ্ণ ঠাকুরের জমিদারী কাচারির নিদর্শণ এখনও দেখা যায়।

সিরঙ্গল : বার ভূঞাদের প্রভাবকে নস্যাত করার মানসে সম্রাট আকবর তার পুত্র সেলিম (জাহাঙ্গীর) কে এখানে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এখানে একটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। সেলিমের নামানুসারে এ গ্রামের নাম পূর্বে ছিল সেলিম নগর। পরে এটা সিরঙ্গলে পরিণত হয়।

ফতেজঙ্গপুর : প্রাচীন নাম শ্রীনগর। মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ যখন বিক্রমপুর আক্রমণ করেন তখন তার সহযোগী যোদ্ধা কেদার রায় কর্তৃক পরাস্ত হয়ে শ্রীনগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মানসিংহ তাকে উদ্ধারের জন্য তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কেদার রায় এ যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জয় চিহ্ন স্বরূপ মানসিংহ শ্রীনগরের নাম পরিবর্তন করে ফতেজঙ্গপুর রাখেন। এটা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মদন মোহন বিদ্যাভূবনের জন্মস্থান। এখানে নাক কাটা বাসুদেবের প্রস্তর মূর্তি রয়েছে।

রাজনগর : বৈদ্য প্রধান স্থান। ফরিদপুরের ইতিহাস লেখক আনন্দ চন্দ্র রায়, ঢাকার ইতিহাস লেখক যতীন্দ্র নাথ রায় ও ঢাকার বিশিষ্ট উকিল রজনীকান্ত গুপ্ত এর জন্ম স্থান। এখানকার অভয়া ও শিবলিঙ্গ বিখ্যাত।

রাম সাধুর আশ্রম : শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ডিঙ্গামানিক ইউনিয়নে অবস্থিত। এখানে শত বছরের পুরনো এই আশ্রমটি এই ডিঙ্গামানিক ইউনিয়নই গোলক চন্দ্র সার্বভৌম ও শ্রীযুক্ত কালি কিশোর স্মৃতি রত্ন মহাশয়ের বাসস্থান। প্রতি বছর শীতের শেষে এই আশ্রমকে কেন্দ্র করে তিন দিনের মেলা বসে। এ ছাড়াও ডিঙ্গামানিক ইউনিয়নের হোগলা গ্রামের কার্তিকপুরের জমিদার বাড়ি বিখ্যাত।

মাওলানা জান শরীফের মাজার : শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বরে মাওলানা জান শরীফের মাজার অবস্থিত। এখানে প্রতি বছর শীতের শেষে তিন দিনের ওরশ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু ভক্তের সমাগম হয়।

বুড়ির হাট মসজিদ : জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার বুড়ির হাট মসজিদটি খুবই বিখ্যাত এবং ইসলামী স্থাপত্যকলার নিদর্শন।

রুদ্রকর মঠ : দেড়শত বছরের পুরনো এই মঠটি সদর উপজেলার রুদ্রকর ইউনিয়নে অবস্থিত। এই মঠটি দেখার জন্য বহু লোক আসে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস-সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে -

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যয়ন	**মে-জুন, ২০০২**
উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ন	**জুলাই, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলাপর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**অক্টোবর, ২০০৩**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের উপর আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।